স্বর্ণজয়ী যুব ক্রিকেটারদের অভিনন্দন

মর্যাদাপূর্ণ শিষ্টাচার আর মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় সব সময় স্বতন্ত্র খেলা ক্রিকেটে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় তুলে দিল যুব ক্রিকেটাররা। গত রোববার একাদশ সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণময় একদিনে যুব ক্রিকেটাররা ফাইনালে শক্তিশালী শ্রীলংকা দলকে ৬ রানে পরাজিত করে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণপদক জয়ের মাধ্যমে দিনটি স্মরণীয় করে রাখলো। গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে সীমিত ওভারের মোকাবেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়, মিরপুরে শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ততম সংস্করণেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলাফল নিষ্পত্তির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ম্যাচটি গড়িয়েছে একেবারে শেষ ওভার পর্যন্ত। শেষের দিকে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তায় ভরা ম্যাচভাগ্য দোলকের মত ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করেছে। হাজার পঁচিশেক দর্শকের টেনশন বাড়িয়ে দিয়ে সীমিত ওভার ক্রিকেট আবির্ভূত হয়েছে স্বমহিমায় পুরো মাত্রায়। এমনি এক স্নায়ুক্ষরা টেনশন ম্যাচে বাংলাদেশের যুব ক্রিকেটাররা শেষ বল বাকি থাকতে শেষ উইকেট তুলে নিতেই গ্যালারিময় ছড়িয়ে পড়ে বিজয় উল্লাস। গ্যালারির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সাথে নেচেছে সারাদেশ। সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে শরীক হয়েছে আনন্দে। সাউথ এশিয়ান গেমসের ২৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত প্রবর্তিত ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জনের জন্য বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দলকে দেশবাসীর সাথে আমাদের পক্ষ থেকেও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

এই অনন্য সাফল্য অর্জনে ইয়াং টাইগাররা যে টিমস্পিরিট, সংকল্প এবং অনুশীলনকালে লব্ধ শিক্ষাকে যে রকম নৈপুণ্যের সাথে প্রদর্শন করেছে, তা অবশ্যই উল্লেখ করার মত। প্রতিযোগিতার লীগ ম্যাচে কিছু ভুল-ত্রুটির মাশুল গুনে শ্রীলংকার কাছে হার মেনেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু দ্রুত সেসব ভুল কাটিয়ে উঠে হাই ভোল্টেজ ফাইনালে সেই শ্রীংলকাকে যেভাবে উড়িয়ে দিয়ে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করল ইয়াং টাইগাররা তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নিউজিল্যান্ড সফরে সিনিয়র ক্রিকেটারদের হতাশাব্যঞ্জক পারফরমেন্সের বলয় থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টার মাঝে ইয়াং টাইগারদের এই সাফল্যগাথা অবশ্যই ক্রিকেটের জন্য মাইলফলক এবং সবার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। শক্তিশালী পাকিস্তান ও শ্রীলংকাকে হারিয়ে সাউথ এশিয়ান গেমস ক্রিকেট বাংলাদেশের স্বর্ণপদক জয় বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে আমাদের শক্তিমত্তা ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাওয়ারই স্বাক্ষর। নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তার বিচারে বাংলাদেশ যুবক্রিকেট দল ভাল অবস্থানে থাকলেও ইতোপূর্বে প্রতিযোগিতার ফলাফলে তার প্রতিফলন তেমন ঘটেনি। কিছুদিন আগে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ক্রিকেটবোদ্ধা বিশেষ মহলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্ট দল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও যুব ক্রিকেটাররা সে আস্থার প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়। ইয়াং টাইগারদের কোচ সারোয়ার ইমরানের মূল্যায়নে বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে যুব ক্রিকেটারদের শক্তিমত্তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষেত্রে এই স্বর্ণপদক জয় বহুদিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বর্ণজয়ী দলনায়ক মোঃ মিথুন জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে মাঠের চারপাশে ল্যাপ অব অনার শেষে স্বপ্ন পূরণের উচ্ছ্বাসে যখন বলেন, ইতিহাসের অংশ হতে দারুণ লাগছে তখন তা সবার জন্যই অনুপ্রেরণাদায়ক।

প্রতিপক্ষ যত শক্তই হোক না কেন মাঠে শক্তিমত্তা, নৈপুণ্য ও সামর্থ্যের সবটুকু নিংড়ে দিতে পারলে সাফল্য বেশীদিন অধরা থাকে না। ইয়াং টাইগারদের স্বর্ণপদক জয় সেই কথাটিই নতুনভাবে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিল। তবে এই সাফল্যে কারোই আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন অবকাশ নেই। একই ভাবে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে ঢিল দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। শেখার কোন শেষ নেই। প্রতিযোগিতায় অন্য দলের ভাল কৌশলগুলো রপ্ত করার পাশাপাশি নিজেদের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। ইয়াং টাইগারদের পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য এখন থেকেই তৈরী হতে হবে। একটি বিজয়ের পর অনেকগুলো সাধারণ ফলাফল একটি দলের ভাবমর্যাদা নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন করে। বলা বাহুল্য, ক্রিকেট অনুরাগীরাও বিজিত নয়, বরং বিজয়ী দলকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন। তাছাড়া সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত ছেদ পড়লে একটি দলের নানা ভাবে অবনমন ঘটে। এই বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিজয়কে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টায় সফল হতে হবে। বিজয়কে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টায় সফল হতে হবে। দেশের ক্রিকেট অনুরাগী জনগণ বারবার

আনন্দে মেতে ওঠার উপলক্ষ খুঁজে পান। যুব ক্রিকেটারসহ সকল স্তরের ক্রিকেটারদের সেই কাজটি সার্থকতার সাথে করতে হবে। নতুন ক্রিকেট প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে আয়োজকরা প্রায়শই যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন, সেগুলোকে নিয়মিত করে তুলতে হবে। বৃহত্তর প্রয়োজনে ক্রিকেট অবকাঠামোগত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা আরো বাড়ানো যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। শীর্ষ স্থানীয় টেস্ট খেলুড়ে দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বয়স ভিত্তিক ক্রিকেটারদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পাশাপাশি যথাযথভাবে বেড়ে ওঠার ওপর নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণ রাখতে হবে, আগামী দিনে এরাই বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে দেশের জন্য বয়ে আনবে গৌরবময় সাফল্য।

জাহাজে হজযাত্রী পরিবহন

জাহাজে হজযাত্রী পরিবহনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। নানা দিকের বিবেচনায় আমরা এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। একটি বেসরকারী শিপিং কোম্পানী জাহাজে হজযাত্রী পরিবহনের প্রস্তাব দিয়েছে। ওই প্রস্তাবের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে প্রস্তাবটি বিবেচনায় নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সম্ভাব্যতা যাচাই করে ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবে। কোথায় জাহাজ ভিড়বে, মোট কত মানুষ যেতে পারবে, কাস্টমস সুবিধা কি হবে, চট্টগ্রামে কি কি সুবিধা আছে, হাজীক্যাম্প কোথায় হবে, কতটা খরচ হবে, কিভাবে সউদী সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, জাহাজে খাবার কি হবে, কি কি সুবিধা যোগ করা প্রয়োজন হবে তাসহ সামগ্রিক বিষয়ে কমিটি রিপোর্ট দেবে। রিপোর্টের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে। মন্ত্রিসভা অনুমোদন করলে প্রক্রিয়া শুরু হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, অতীতে জাহাজে হজযাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৮৫ সালে হজযাত্রীরা সর্বশেষ জাহাজে করে হজে যান এবং হজ করে ফিরে আসেন। এরপর জাহাজের অভাবে নৌপথে হজযাত্রী পরিবহন বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘ আড়াই দশক পরে পুনরায় জাহাজে হজে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। নৌপরিবহনমন্ত্রী পত্রিকান্তরে জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। গণমুখী এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সঙ্গতকারণেই কাম্য।

প্রস্তাব প্রদানকারী বেসরকারী শিপিং কোম্পানী দু’টি জাহাজের মোট ছটি আপ ও ছটি ডাউন ট্রিপ পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রতি ট্রিপে তিন হাজার করে মাট ১৮ হাজার যাত্রী পরিবহন করা হবে। চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা পৌঁছতে সময় লাগবে সর্বোচ্চ সাতদিন। ব্যয় হবে ৮৫০ ডলার থেকে ১০০০ ডলার অর্থাৎ ৬০ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৭০ হাজার টাকা। বিমানের তুলনায় ব্যয় সাশ্রয় হবে ৪০ শতাংশ। এক সময় হজযাত্রী পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌপথ। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সব শ্রেণীর হজযাত্রী জাহাজে করে হজে যেতেন। সে রকম ব্যবস্থা জাহাজে ছিল। নৌপথে হজযাত্রী বহন বন্ধ হয়ে গেলে আকাশপথই একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। বিমানের ভাড়া তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ায় এবং প্রতি বছর বিমান ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নিম্নবিত্ত তো বটেই, মধ্যবিত্তেরও অধিকাংশের পক্ষে হজে যাওয়ার প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া বয়স্ক অনেকের পক্ষে এবং যাদের বিমানভীতি আছে, তাদের পক্ষে বিমানে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইচ্ছে, এমন কি সামর্থ্য থাকলেও তারা হজ করতে পারছেন না। জাহাজ কেবল সাশ্রয়ী নয়, সব শ্রেণীর ও সব বয়সী মানুষের ভ্রমণের জন্য উপযোগী এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। বলার অপেক্ষা রাখে না, জাহাজে হজে যাওয়ার ব্যবস্থা হলে আরও বহু মানুষ হজে যাওয়ার সুযোগ নিতে পারবেন এবং হজযাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির অন্তত একবার হজ করা ফরজ। জাহাজে হজে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলে আরো অধিক সংখ্যক মানুষ এই ফরজ এবাদতটি পালন করতে পারবেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম বাড়লেও তার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের পুরাটা এখনও ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এ বন্দরের মাধ্যমে হজযাত্রী পরিবহন ভালোভাবেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এখনও বিপুলসংখ্যক মানুষ জাহাজযোগে হজে যায়। জেদ্দা বন্দরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা মজুদ আছে। এতদিন সমস্যা ছিল জাহাজের। এখন তার ব্যবস্থা হয়ে গেলে নৌপথে হজযাত্রী পরিবহন কঠিন বা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। আমরা জানি, এক সময় চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হাজীক্যাম্প ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হজযাত্রীরা সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন এবং নির্দিষ্ট দিন-তারিখে হজে যাত্রা করতেন। এখন সেই

হাজী ক্যাম্পের কি অবস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই তা ভালো জানে। চট্টগ্রামে হাজীক্যাম্পের জন্য জায়গার অভাব হওয়ার কথা নয়। বন্দর সুবিধা যাচাই-বাছাই করাসহ হাজীক্যাম্প নির্মাণ এবং সউদী সরকারের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারী কোম্পানী খরচের যে হিসাব দিয়েছে তা ভালোভাবে খতিয়ে দেখে খরচ আরও কমানো যায় কিনা তা দেখা যেতে পারে। কাস্টমসের ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। জাহাজে খাবারের ব্যবস্থা এবং কি ধরনের খাবার উপযোগী হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন কাজ নয়। জাহাজে যেহেতু হজযাত্রীদের ৬/৭ দিন থাকতে হবে, সুতরাং এই সময়ে তাদের অবস্থান যাতে সহজ হয়, প্রয়োজন যাতে পূরণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধা এমন হতে হবে যাতে সব বিত্তের মানুষ আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারে। আমরা আশা করবো, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

’৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন কতিপয় আইনী প্রশ্ন

মোবায়েদুর রহমান

‘শেষ হয়েও হইল না শেষ।’ কবিতার ভাষায় আমরা অনেকবার বলেছি, অনেকবার লিখেছি, শেষ হয়েও হইল না শেষ। পঞ্চম সংশোধনী মামলার চূড়ান্ত পর্বে এসে কবিতার এই চরণটি যে এমন প্রকট সত্য হবে সেটা কে জানত? তাই দেখা গেল যে, সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ রায়টি ঘোষণা করলেন নিম্নোক্ত কয়েকটি ইংরেজি শব্দে “কদণ যর্ণর্ধধমভ ধ্র ঢধ্রব্ধ্রণঢ ষর্ধদ বমঢধতধডর্টধমভ্র টভঢ মঠ্রণরশর্টধমভ্র.”

অর্থাৎ, “আবেদনটি কতিপয় সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণসহ খারিজ হইল।” ঐ সব সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণ কি, সেটি আজ ৭ দিন হয়ে গেল, এখনও জানা যায় নি বা প্রকাশিত হয়নি। কতদিন লাগতে পারে, এ ব্যাপারে এ্যাটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম গত ৭ ফেব্রুয়ারী একটি বাংলা দৈনিকে বলেছেন, “এ ধরনের মামলায় হয়ত অনেক ক্ষেত্রে মাসখানেক লেগে যায়। অনেক সময় বেশিও লাগতে পারে। এটা যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা তাই বিচারপতিদের প্রতি অনুরোধ, যাতে তাড়াতাড়ি এর রায় বের হয়।” ৬ বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের যে বেঞ্চটি এই ৮/১০টি শব্দের রায় ঘোষণা করেছেন সেই ফুলবেঞ্চের প্রধান অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জুল ইসলাম ইতোমধ্যে তার চাকুরী জীবন থেকে অবসরও গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে বেঞ্চের অপর সদস্য বিচারপতি ফজলুল করিম প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। যদিও আলোচ্য বেঞ্চটি ছিল ফুল বেঞ্চ তবুও আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি চূড়ান্ত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি হলেন বিচারপতি খয়রুল হক। কারণ জনাব খয়রুল হক যখন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তখন তিনি এবং বিচারপতি ফজলে কবিরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায়টি ঘোষণা করেছিলেন। তাই আপিল বিভাগের বিচারিক কাজে তিনি অংশ নিতে পারেননি। বলা বাহুল্য, রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায় নি। ফলে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় এখনও জানা গেল না। ফলে এ কথা এখন আর বলা যাচ্ছে না যে, খয়রুল হক সাহেবের বেঞ্চ যে রায়টি দিয়েছিলেন সেটি পুরোপুরি বহাল থেকে গেল, অথবা তার রায়টি ব্যাপকভাবে মাজাঘষা করা হয়েছে। এর ফলে আপিল বিভাগের রায়টি এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণই থেকে গেল। অথচ কি আশ্চার্য, সেই অসম্পূর্ণ রায় নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা ও সমর্থনের তুফান ছুটেছে। এই আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ এই রায়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে বিপুল আগ্রহ। আইনের খুঁটিনাটি দিক সকলেই যে ভাল বোঝেন সেটি সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু শুধু উচ্চবিত্ত এবং উচ্চশিক্ষিতদের ড্রইংরুমেই নয়, শুধু বড় সাহেবদের সুসজ্জিত অফিস কক্ষের ৪ দেয়ালের মধ্যেই এই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই, সাধারণ মানুষের মাঝেও এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ আইন-কানুন নিয়ে অতো নাড়াচাড়া না করলেও তাদের প্রশ্ন খুব সোজা এবং সরল : কি, ভাই, ইসলামী দলগুলো কি থাকবে? নাকি বাতিল হয়ে যাবে? সমাজতন্ত্র কি আবার ফিরে আসছে? আল্লাহর প্রতি ঈমান নাকি বাতিল হয়ে যাবে? ধর্ম নিরপেক্ষতা নাকি আবার ফিরে আসছে? এগুলিই সাধারণ মানুষের মাঝে প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাসে, রেস্টুরেন্টে এবং বিশেষ করে বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে এই ধরনের আলোচনা খুব জমে উঠছে। আপিল বিভাগের এই রায়ের আগে পর্যন্ত সকলেই ঢালাওভাবে বলছিলেন যে, ওগুলো সব বাতিল হয়ে গেছে এবং অন্যগুলো সব ফিরে আসছে। অন্যদিকে এ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট

মাহবুবে আলম সবসময়ই বলছেন এবং আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার সফিক আহমেদ মাঝে মধ্যে বলছেন যে, লিভ টু আপিল খারিজ হওয়ার ফলে '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আপিলকারীদের অন্যতম আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খুব জোর দিয়ে বলছেন যে, আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় যাই হোক না কেন, '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আপিলকারীদের অপর আইনজীবী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি টি এইচ খান এ্যাটর্নি জেনরেল বা মওদুদ আহমদ কারো মন্তব্যের সাথে একমত নন। জনাব মওদুদ ও টি এইচ খান উভয়েরই মতামত হল এই যে, দেশের সামগ্রিক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এমন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলায় লিভ মঞ্জুর হল না, সেটি চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। লিভ মঞ্জুর হবে, বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষ তাদের যত রকম আর্গুমেন্ট আছে সব পেশ করবেন এবং তার পর বিজ্ঞ বিচারকরা তাদের রায় দেবেন, তেমনটাই নিয়ম। কিন্তু এই মামলায় লিভ ও দেয়া হল না এবং মাত্র ৬ দিনের শুনানির পর লিভ খারিজ করা হল। এটা অস্বাভাবিক। এমন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সংশোধন এবং পর্যাবেক্ষণের কথা বলা হল, কিন্তু সেই সংশোধন এবং পর্যবেক্ষণ ছাড়াই লিভটি খারিজ করে দেয়া হল– এমন ঘটনা তিনি তার ৫০ বছরের আইন পেশাতে দেখেননি বলে বিচারপতি টি এইচ খান মন্তব্য করেছেন। যাই হোক, এই আলোচনা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে জনাব খয়রুল হকের রায়ের মধ্যেই আমাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যখন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হবে তখন এই বিষয়ে হয়ত আরো কথা বলা যেতে পারে।

॥ দুই ॥

'৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে আমাদের কয়েকটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। সেটি হল এই যে, আমাদের সংবিধান এ পর্যন্ত মোট ১৪ বার সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বে আরো ৪ বার সংশোধিত হয়েছে। এসব সংশোধনী সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরবার। প্রথম সংশোধনী হল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন। দ্বিতীয় সংশোধনী হল জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন। তৃতীয় সংশোধনী হল মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অর্থাৎ বেরুবাড়ী হস্তান্তর এবং দহগ্রাম এবং আঙ্গরপোতা ছিটমহলগুলো বাংলাদেশে হস্তান্তর ও তিনবিঘা করিডোর স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের নিকট ইজারা দেয়া সম্পর্কিত চুক্তি অনুমোদন। চতুর্থ সংশোধনী হল বাকশাল গঠন।

এরপর আরো ১০টি সংশোধনী রয়েছে। সেগুলো এই মুহূর্তে আলোচনা না করলেও চলবে। এখন '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যেতে হলে ২টি পথের যেকোনো একটি অনুসরণ করতে হবে। একটি হল, যদি আপিল বিভাগের রায়ে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের কোনো বড় ধরনের সংশোধন না হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চম সংশোধনীগুলো বাতিল করে ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত (৪ নভেম্বর তারিখে গৃহীত) সংবিধানটি ছাপিয়ে দিলেই '৭২ সালে ফিরে যাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র ফিরে আসবে এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। '৭২-এর সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ ফিরে আসায় মুসলিম উম্মাহর সাথে সংহতির অনুচ্ছেদটিও বিলুপ্ত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনীর কি হবে? ঐগুলো তো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিরে আসবে না। '৭২-এর মূল সংবিধানে নিরাপত্তা আইন এবং জরুরী আইন ছিল না। অনুরূপভাবে বেরুবাড়ীও ভারতকে দেয়া হয়েছে '৭২-এর সংবিধান জারির পর তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে। সেই বেরুবাড়ীরই বা কি হবে? অবশ্য অন্য একটি মত হল এই যে, যদি শুধু পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয় তাহলে ঠিক '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া হয় না। তাই এক্ষেত্রে পরিষ্কার করা দরকার যে, যদি তারা '৭২-এর সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করেন তাহলে জরুরী অবস্থা ও বেরুবাড়ী সম্পর্কিত সংশোধনী ২টিও পুনরুজ্জীবিত হবে।

দ্বিতীয় পথ হল এই যে, সংসদে বিল উত্থাপন করে '৭২ সালের মূল সংবিধানের বাতিলকৃত ধারাগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এটি করতে গেলে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং সংশোধন পদ্ধতিতে হাত দিতে হয়। সেগুলো করতে গেলে শুধু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই চলবে না, সেগুলো গণভোটেও পাস করাতে হবে।

আল্লাহর প্রতি আইন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি বাতিল এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এই ৩টি বিষয় স্পর্শকাতর বিষয় বলে বিবেচিত। এসব বিষয় গণভোটে দিলে ফলাফল কি ইতিবাচক হবে, নাকি নেতিবাচক হবে, সেটি হলফ করে এই মুহূর্তে কে বলার দায়িত্ব নেবেন? এসব বিষয় বিবেচনা করলে সুপ্রিম

কোর্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনই নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেখানে রয়ে গেছে একটি বিরাট প্রশ্ন। হাইকোর্টের রায়ে যা বলা হয়েছে আপিল বিভাগ কি তার সবগুলোই সমুন্নত রাখবে? তাহলে তো মডিফিকেশন এবং অবজারভেশনের কথা থাকত না। তাই সরকার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ, সকলেরই উচিত, এই মুহূর্তে জল্পনা কল্পনার জাল না বুনে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য অপেক্ষা করা।

॥ তিন ॥

আইনী প্রশ্নের শেষ নাই। যে ৬ দিন ধরে লিভ টু আপিলের শুনানি হয় সেই শুনানিতে যারা মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজে পড়েছেন তারা ‘পক্ষেবিপক্ষে’ অনেক যুক্তিতর্ক শুনেছেন। আইনের চুলচেলা বিশ্লেষণে অনেক পয়েন্টই বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঃ বিষয়টি কি শুধুই আইনী? যখন ধর্ম নিরপেক্ষতা, আল্লাহর প্রতি ঈমান, সমাজতন্ত্র, বাংলাদেশী/বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা, পররাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া বা না দেয়া, এগুলো বিষয় এসে পড়ে তখন বিষয়টি অবধারিতভাবে হয়ে পড়ে রাজনৈতিক। বাংলাদেশের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি হল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। আরেকটি হল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। দুই ঘরানার দুটি রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল ফারাক। বাংলাদেশে জনগণের মাঝেও এই দুটি রাজনৈতিক ঘরানারই রয়েছে বিশাল প্রভাব। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৪টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচনে একবার বিএনপি আরেকবার আওয়ামী লীগ– এভাবে ২ বার বিএনপি এবং ২ বার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। একবার বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে, আরেকবার আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা হল আওয়ামী ঘরানার রাজনৈতিক দর্শন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হল বিএনপি ঘরানার রাজনৈতিক দর্শন। আজ যদি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় আর পরবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে কি পরিস্থিতি হবে? তারা তো তখন তাদের রাজনৈতিক দর্শন সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন। এই বিষয়টি মহামান্য আদালতের বিবেচনায় থাকলে সেটি দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তথা সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাকে সুপ্রিম কোর্ট অক্ষুণ্ণ রাখবে। তাহলে উপায় কি? সামরিক ফরমান বলে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। তেমনি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমেও কোনো রাজনৈতিক বিষয়ের ফয়সালা হওয়া উচিত নয়। সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক বিষয়াবলী থেকে মুক্ত রাখা উচিত। রাজনৈতিক ইস্যুসমূহ ফয়সালার মাধ্যম হবে রাজনৈতিক মঞ্চ।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

যানজট নিরসনে নগরীর সরু রাস্তাগুলো বড় করা হোক

ঢাকা শহরে এক সোয়া কোটির বেশি লোকের বসবাস হওয়া সত্ত্বেও রাস্তার সংখ্যা নগণ্য। রাস্তা নেই, যানজট তাই। এই যানজট নিরসনে সরকারকে এখনই সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে যা যুগ যুগ অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। প্রয়োজনে পথচারী, যাত্রী ও যানবাহনের সুবিধার্থে পুরনো এবং নতুন ঢাকাতে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে কারো ক্ষতি হলেও বৃহত্তর নগরবাসীর সুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটের কারণে রাস্তায় অসহায় অবস্থায় থাকতে রাজী নয়। জনগণ এ ধরনের দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়।

ঢাকা এখন বিশ্বের অন্যান্য শহরের থেকে কম ব্যস্ত নয়। ঢাকাকে আরো আধুনিক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং ভিক্ষুক মুক্ত করতে পারলে আর তেমন কোন বাধা থাকে না ঠিকই তবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য যানবাহনের ড্রাইভার ও এদের সহযোগীদের ট্রেনিং প্রদান করা উচিত। বহু দেশী-বিদেশী কোম্পানী শিল্প-কারখানা এখন ঢাকায়। এদের ব্যবসা ও বাণিজ্য দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে বলেই ঢাকাকে সকলের সুবিধার্থে আরো আধুনিক ও

যানজটমুক্ত করতে হবে। গোটা ঢাকায় মানুষের চাহিদানুযায়ী ট্রান্সপোর্ট নেই। এ অবস্থায় যানজট নিরসনে এখনই সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে আগামী প্রজন্ম নগরীতে যানজটমুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারে। বিশেষ করে ফার্মগেট হতে মালিবাগ, সদরঘাট হতে গুলিস্থান, মতিঝিল, পোস্তগোলা, ফার্মগেট হতে গুলশান-১ ও ২, হতে এলিফ্যান্ট রোড, ধানমণ্ডি হতে মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী হতে কমলাপুর ও গুলিস্তান, মিটফোর্ড হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তাটি অর্থাৎ ইসলামপুর হতে যাত্রাবাড়ী হতে কমলাপুর ও গুলিস্তান, মির্টফোর্ড হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তাটি অর্থাৎ ইসলামপুর হতে চকবাজার, মালিবাগ-মৌচাক হতে মগবাজার, গ্রীন রোড এবং প্রেসক্লাব হতে শাপলা চত্বর ইত্যাদি রাস্তাগুলোর বিকল্প রাস্তা অথবা পার্শ্ববর্তী সরু রাস্তাগুলো চওড়া করা এবং বেশ কিছু রাস্তার ওপর ফ্লাই ওভার তৈরীর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এখনই নিতে হবে। না হলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, পুরানো ঢাকার জন্য আলাদা পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। কেননা পুরনো ঢাকা এবং নতুন ঢাকার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হলে উভয় অংশের জনগণ উপকৃত হবে। সাধারণত: পুরনো ঢাকার প্রায় সবকটি রাস্তা সরু। আকারে ছোট এ সকল রাস্তা দিয়ে বড় যানবাহন কেন, যাত্রী নিয়ে ছোট ছোট গাড়ী চলাচল করাও দুষ্কর। রিকশার জ্বালায় পুরান ঢাকা অচল। সে জন্য পুরান ঢাকার সরু রাস্তা জনস্বার্থে বড় করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় যানজটের কারণে পুরানো ঢাকা ও নতুন ঢাকা'র সরু রাস্তাঘাট বড় এবং নগরীতে আগে নতুন নতুন রাস্তা তৈরী করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রাজউক এবং ঢাকা সিটি করপোরেশন এর প্রতি অনুরোধ জানাই।

–মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী

১৭, হরিচরণ রায় রোড,

ফরিদাবাদ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪।

৪-৫ কিমি কাঁচা রাস্তা পাকা হোক

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলাধীন বাকিলা বাজার হতে মতলব উপজেলার নারায়ণপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি হাজীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং মতলব উপজেলার পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মতলব উপজেলার নারায়ণপুর বাজার হতে গৌরীপুর হয়ে ঢাকা পর্যন্ত বাস চালু হয়েছে। কিন্তু বাকিলা বাজার হতে নারায়ণপুর বাজার পর্যন্ত ১২-১৩ কিমি রাস্তার মধ্যে কাপাইকাপ হতে লেকোটা পর্যন্ত ৪-৫ কিমি কাঁচা রাস্তা পাকা না হওয়ায় হাজীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং মতলব উপজেলার পূর্বাঞ্চলের হাজার হাজার জনসাধারণ ৪-৫ কিমি রাস্তার জন্য ৭০-৮০ কিমি রাস্তা ঘুরে কুমিল্লা হয়ে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াত করতে হয়। এতে ২-৩ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় এবং বহু অর্থ অপচয় হয়। তাছাড়া উক্ত রাস্তার পার্শ্বেই রয়েছে শ্রীপুর হাইস্কুল, নোহাটা সিনিয়র মাদ্রাসা, বাজারগাঁও হাইস্কুল, কাপাইকাপ সিনিয়র মাদ্রাসা, নাসির কোট হাইস্কুল, নাসির কোট শহীদ স্মৃতি কলেজ, কাশিমপুর হাইস্কুল, পয়ালী হাইস্কুল, গিলাতলী সিনিয়র মাদ্রাসা ও বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়। তন্মধ্যে রাজারগাঁও হাইস্কুল ও নাসির কোট শহীদ স্মৃতি কলেজে রয়েছে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র। উল্লেখিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের হাজার হাজার ছাত্র/ছাত্রী এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে থাকে। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীগণের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাছাড়াও রাস্তার উপর বেশ কয়েকটি হাটবাজার রয়েছে, তাতে মালামাল আনা নেয়ার ক্ষেত্রে নিদারুণ কষ্ট হয়।

এমতাবস্থায় বাকিলা-নারায়ণপুর রাস্তার মধ্যে কাপাইকাপ হতে লেকোটা পর্যন্ত ৪-৫ কিমি কাঁচা রাস্তা জরুরীভিত্তিতে পাকা করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যা দূর করতে বিনীতভাবে আবেদন জানাচ্ছি।

এলাকাবাসীর পক্ষে

মোঃ ইউনুছ মিঞ্রা (অডিটর)

ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইউনিট

হিসাব মহানিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

রাস্তাটির সংস্কার হবে কবে?

নীলফামারী জেলার অন্তর্গত সৈয়দপুর উপজেলার বাণিজ্যিক শহর সৈয়দপুরে ওয়াপদা মোড় থেকে সৈয়দপুর বেঙ্গল থানা হয়ে সোহেল রানা মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি শুধু এই শহরের ব্যস্ততম রাস্তাই নয় আশপাশের অন্যান্য সবকটি উপজেলা-জেলার লাখ লাখ মানুষ এবং লক্ষাধিক যানবাহন এই রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করে। কিন্তু সাক্ষাৎকারের অভাবে, বর্তমানে এই রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এবড়ো-থেবড়ো, এই রাস্তা দিয়ে বর্তমানে যাতায়াত করাটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই রাস্তাটির ব্যাপারে বারবার লেখালেখি করা হয়েছে কিন্তু এই পর্যন্ত, এ ব্যাপারে কোন প্রকার পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কি হতে পারে।

ডাক্তার আবুল হাসান বুলু এমবিবিএস

হাজীবাড়ী (ওয়াপদামোড়), গ্রাম-বোতলগাড়ী, পোস্ট-সৈয়দপুর-৫৩১০, জেলা-নীলফামারী।

গ্যাস সংযোগ চালু করা হোক

বিগত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময়ে বিদ্যুৎ সমস্যায় জনসাধারণ ছিল অতিষ্ঠ। এখন তার পাশাপাশি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ‘গ্যাস’ ব্যবহার করে মানুষ যেইটুকু স্বস্তি ও শান্তি পাচ্ছিল তাও আর থাকছে না। অথচ জনসাধারণ হাজার-লাখ টাকা ও শ্রম ব্যয় করে গ্যাসলাইনের ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি আমাদের চাঁদপুর জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় কয়েক মাস ধরে লাইন থেকে এমনকি রাইজার থেকেও হঠাৎ করে সংযোগ অনুমোদন না দেয়ায় আবাসিক জীবনের উপর এমন কিছু প্রভাব সৃষ্টি করেছে, যা ভুক্তভোগী ব্যতিত বুঝা সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ নেই, এখন গ্যাসও নেই। তাই গ্যাস সংযোগ/ন্যূনপক্ষে রাইজার থেকে ব্যবহার অনুমোদনের যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করি।

ভুক্তভোগীদের পক্ষে–

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান প্রভাষক

চান্দ্রা ইসলামীয়া ডিগ্রি মাদ্রাসা, চাঁদপুর।

নকল ইনসুলিন

দেশে দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা অনেক। এই রোগের জন্য ইনসুলিন ইঞ্জেকশন অপরিহার্য। এই রোগ নিরাময়যোগ্য নয়। তবে নিজেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী আয়ত্তে রাখতে হবে। ভেজাল বিরোধী অভিযানে নকল ইনসুলিন ইনঞ্জেকশন কারখানার হদিস পান ভ্রাম্যমাণ আদালত, উদ্ধার করেন বেশকিছু নকল ইঞ্জেকশন ইনসুলিন। ইদানীং বাজারেও লাগেজ পার্টি থেকে ক্রয়কৃত ইনসুলিন ইঞ্জেকশন বেশিরভাগই ভেজাল মুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র বিভিন্ন দেশ থেকে চোরাইপথে মেয়াদোত্তীর্ণ ইনসুলিন ইঞ্জেকশন মিটফোর্ড মার্কেটে বিক্রি করছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল ওষুধ দেদারছে বিক্রি হচ্ছে অথচ ওষুধ প্রশাসন নীরব ওষুধ সাধারণ কোন পণ্য নয়। ভেজাল ওষুধ সেবনে মারাত্মক পার্শ্বপতিক্রিয়ার এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুও অনিবার্য।

দুঃখ হয়, ঘটনা ঘটার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ে না। ঘটনা ঘটলেই কেবল টনক নড়ে। ভেজাল ইনসুলিন ইঞ্জেকশন বিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চায়। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

-এ, কিউ, এম, মাহফুজ উল্লা (বাচ্চু)

লেখক ও সাংবাদিক ২৪৪ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা−১২১৭।